১৭৫

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..28..JAN..1998..

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ছাত্র ও শিক্ষক

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

ছাত্র - শিক্ষক সম্পর্কটা ভারি অদ্ভুত। যেমন এ স্নিগ্ধ আর পবিত্র তেমনি মধুর আর চিরদিনের। একবার ছাত্র মানে চিরদিনের জন্যে ছাত্র, একবার শিক্ষক মানেও চিরকালের জন্যে শিক্ষক। এই সম্পর্কের কোনোদিন মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ছাত্র-শিক্ষকের দেখা হোক না কেন, সেই মুহূর্তটিতে তারা সেই প্রথম দিনের মতোই উজ্জ্বল। আর এর কারণ সোজা। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষকদের সামনে পায় তাদের জীবনের সবচেয়ে প্রাথমিক ও অনুভূতিময় দিনগুলোয়, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় ভরা জীবনের মহত্তম লগ্নে। অমলিন বিস্ময় আর স্বপ্নের অঞ্জন চোখে মেখে এই সময় তারা তাদের শিক্ষকদের দিকে তাকায়, শিক্ষক তাদের চোখে প্রতিভাত হয় স্বর্গের দুর্লভতম দেবতার চেহারায়। তাদের নিষ্পাপ চোখের পাতায় শিক্ষকের এই যে দেবদুর্লভ ছবি এই সময় গাঁথা হয়ে যায় সেই জ্যোতির্ময় ছবিটি তারা মৃত্যু পর্যন্ত হৃদয়ে বয়ে বেড়ায়। যেখানে যতদিন পরেই ঐ শিক্ষকের সাথে দেখা হোক না কেন সে তার সামনে অল্প বয়সের ঐ ছাত্র বা ছাত্রীটি হয়ে যায়। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে আমার জীবনের একটা ছোট গল্প শোনাতে চাই। একদিন মিরপুর থেকে বাংলা মোটরের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। তখন দেশে মার্শাল ল' চলছে, সেই সাথে ট্র্যাফিক সপ্তাহের কড়াকড়ি। যেখানে-সেখানে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র চেক করছে, শাস্তিও চলছে এলোপাতাড়ি। আমার গাড়িতে দুয়েকটা কাগজপত্রের গোলমাল ছিল, ইনসিওরেন্স বা ফিটনেস কিছু একটা বাকি। এমনিতে ভয়ে ভয়ে আছি, কোথায় ট্র্যাফিক পুলিশ গাড়ি ধরে বসে, লজ্জায় পড়তে হয়। দেখে শুনে যাচ্ছি, সামনে সার্জেন্ট-আকীর্ণ চৌমাথা দেখলে এড়িয়ে চলছি, কোনোমতে বাসায় পৌঁছোতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ফার্মগেট দিয়ে শহরে আসার পথে খুব একটা ট্র্যাফিকের ঝামেলা নেই, তাই সেই পথ ধরলাম। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত্রি হয়। ফার্মগেটের কাছাকাছি হতেই দেখি সেখানেও ট্র্যাফিক সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ওপর কপাল এমনি খারাপ যে মোড়ের কাছে আসতেই লাল বাতি জ্বলে উঠল। সব মিলে সোনায় সোহাগা। টিপটিপ বুকে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি একটা কালো বিশাল চেহারার সার্জেন্ট আমার গাড়ি তাক করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। অত বিরাট আর দানবীয় সাইজের সার্জেন্ট আমি বাংলাদেশে আর দেখিনি। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তবু এসব নিয়ে আমার যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই সেটা দেখানোর জন্য মুখে নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একসময় টের পেলাম দৈত্যটা মচমচ করে পা ফেলতে ফেলতে ঠিক আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি কাঁধের ওপর তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ভয়ে ভয়ে একটু একটু করে তার দিকে যেই মুখ ফেরাতে গেছি, অমনি ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সেই বিশাল অভ্রভেদী দৈত্যটা যেন হঠাৎ কুকড়ে-দুমড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল সামনে। পুলিশি কায়দায় নয়, উপচানো খুশিতে দাঁতগুলো যথাসম্ভব উদ্ভাসিত করে, আকর্ণ হাসিতে বিস্ফারিত হয়ে আনন্দ-বিকৃত গলায় চি হিহি করে বলে উঠল : 'স্লামালইকুম স্যার'! বিশ-পঁচিশ বছর আগে গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আসা একাদশ শ্রেণীর অবিকল সেই ছেলেটি। সেদিনের অসহায় অপ্রস্তুত চেহারার সেই করুণ ছাত্রটি। কিন্তু এমন ত্যাড়া-বেঁকা হয়ে কেন ওভাবে এগিয়ে পড়ল সে? কারণ সোজা। যেদিন সে কলেজে পড়তে এসেছিল সেদিন সে কৈশোর অতিক্রান্ত একজন অনুভূতি-কাঁপা তরুণ। তার দুই চোখে সেদিন শুধু আবেগ আর বিস্ময়! একটা নতুন, অপরিমেয় আর ঐশ্বর্যময় জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে সে তখন। জীবনে উন্নতি করে এই পৃথিবীর সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার। সেদিন তার তুচ্ছ জীবনের সামনে আমরা, এই শিক্ষকরা ছিলাম দেবতার আসনে আসীন। তার স্বপ্ন আর বিস্ময়ভরা জীবনের সবচেয়ে দেবদুর্লভ মানুষ। আজ অনেকদিন পর তার সামনে পড়তেই মাঝখানের এতগুলো দিন মুহূর্তে তার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে। সেই অসহায় করুণ ছেলেটি ভেঙে আঁকাবাঁকা বিস্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবনের সূচনালগ্নের সেই পরাক্রান্ত কিংবদন্তিটির সামনে। সে যে আজ একজন ডাটপাটওয়ালা অফিসার, অনেক দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তা এক মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গেছে তার স্মৃতি থেকে। এর মধ্যকার তার সব অগ্রগতি আর সাফল্য সব মিথ্যা হয়ে গেছে। বিশালকায় একটা দৈত্য একতাল কাদা হয়ে গেছে। এই হলো শিক্ষকের সামনে একজন ছাত্র। শৈশবের অনুভূতিময় দিনগুলোয় যে চোখে সে একবার শিক্ষককে দেখেছে এবং শিক্ষকের সামনে নিজেকে যা বলে অনুভব করেছে, চিরদিন সে তাই। পরিণত বয়সের বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে সে তার চিন্তা-ভাবনার জগতে অনেক পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু কিশোর-তরুণ বয়সের এই নায়কদের ব্যাপারে তার অনুভূতির খুব একটা পরিবর্তন হয় না। হাইকোর্টের জজ বা সরকারের সচিব যে ছেলেবেলার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দেখলে আচমকা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন, এর কারণ এই। এ হলো জীবনের প্রথম বিস্ময়ের সামনে মানুষের চিরকালের প্রণতি, জীবনের প্রগাঢ়তম প্রাপ্তির কাছে মানুষের সকৃতজ্ঞ ঋণস্বীকার।

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা সত্যি ভারি অদ্ভুত। আগেই বলেছি ছাত্রদের জীবনের প্রথম নায়ক তাদের শিক্ষকরা। কিন্তু ছাত্রও কি শিক্ষকের জীবনে এমনি এমনি অর্থময় হয়ে বেঁচে থাকেন? একজন ছাত্র তার জীবনের গুটিকয় শিক্ষককে হৃদয়ের ভেতর যত বড় জায়গা দেয় একজন শিক্ষক কি তার একটিমাত্র হৃদয়ে তাঁর সারা জীবনের এত ছাত্রের প্রত্যেককে সেই জায়গা দিতে পারেন? উত্তরটা কঠিন, তবু বলতে চাই, পারেন, সুহৃদসম্পন্ন শিক্ষক পারেন। হয়ত একটু আলাদাভাবে, আলাদা অর্থে পারেন, তবু পারেন। একজন ভালো শিক্ষকের কাছে ছাত্র কী? ছাত্র তো তাঁর আত্মার সন্তান—অচেনা, অপরিচিত, রক্তসম্পর্কহীন; তবু দূরদূরান্ত থেকে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে তাঁরই জীবন শোষণ করে সম্ভাবনা নিয়ে বেড়ে ওঠা তাঁরই অনিবার্য উত্তরাধিকারী। এই ছাত্রই তো তাঁর সম্ভাবনা, বিকাশ, পরিণতি—তাঁর জীবন, জীবনের অর্থময়তা, জন্ম এবং জন্মান্তর। তবু এটা ঠিক যে শিক্ষক এবং ছাত্রের অবস্থান এক নয়। একজন ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি নয়, হৃদয়ের ওপর উজ্জ্বল আলো-ফেলা শিক্ষকের সংখ্যা হয়ত আরও কম, কিন্তু শিক্ষকের জীবনে ছাত্রের সংখ্যা অগণিত। লেখকের যেমন পাঠক, গায়কের যেমন শ্রোতা, টিভি উপস্থাপকের যেমন দর্শক, রাজনীতিবিদের যেমন জনতা, শিক্ষকের তেমনি ছাত্র। একজন শিক্ষক আজীবন দাঁড়িয়ে থাকেন ছাত্র নামের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে। লেখক, গায়ক, রাজনীতিবিদ বা টিভি উপস্থাপকের পক্ষে যেমন তার শ্রোতা-দর্শকদের আলাদাভাবে চিনে রাখা সম্ভব নয়, শিক্ষকের বেলায়ও প্রায় তাই। তবু কি করে যেন আমরা শিক্ষকরা তাদের চিনে ফেলি। ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে কোথাও একজন ছাত্র থাকলে মুহূর্তেই আমরা তাকে শনাক্ত করে ফেলি। কী করে যেন একটা গোপন অতিন্দ্রিয় ও রহস্যময় যোগাযোগ ঘটে যায়। বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে হলেও দেখা মাত্র আমরা তাকে অব্যর্থভাবেই টের পাই। মায়ের মতো তার গায়ের গন্ধ চিনে ফেলি। নিজের অজান্তে, চেতনার অগোচরে চিনে ফেলি। শিশু যেমন মাকে, পাখিরা যেমন শত্রুকে, মানুষ যেমন মৃত্যুকে আমরা শিক্ষকরা তেমনি ছাত্রকে চিনি। এই চেনা জীবনের এক গভীর অতল তলের চেনা। এই চেনা রহস্যময় আর অলীক। কেবল মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে এর পরিমাপ করা কঠিন।

না, একজন শিক্ষক সারাজীবনের সব ছাত্রকে চেনেন না। তবু যে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের এমন একটা সুগভীর হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার কারণ শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রকে আলাদাভাবে না চিনলেও তাঁর সারাজীবনের ছাত্র-পরিমণ্ডলটিকে গভীরভাবে চেনেন। এই ছাত্র-জগৎই তাঁর ঘর, তাঁর বসতবাড়ি, তাঁর দৈনন্দিন ঘরকন্নার আঙিনা। এইখানে আলোক-ভরা নীল আকাশের নিচে সুখে-দুঃখে, শীতে-গ্রীষ্মে তিনি বেড়ে ওঠেন, পূর্ণ হন। এই ছাত্র-জগৎ তার প্রথম জন্মস্থান এবং সর্বশেষ দেবালয়। এইখানে দিনের পর দিনের প্রার্থনা আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়ে তিনি পূত হন, পাপহীন হন। এইখানে ঘটে তাঁর দ্বিজত্ব ও নির্বাণ। চারপাশে জড়ো হওয়া ছাত্রদের ভেতর সারাজীবন থাকতে থাকতে তাদের নিশ্বাস তাঁর চেনা হয়ে যায়, তাদের বুকের উত্থান-পতন, রক্তধারার ছুটে চলা তাঁর নিজের প্রতিটি জীবকোষে তিনি অনুভব করেন।

তবে একজন ভালো শিক্ষকই কেবল এটা পারেন, অশিক্ষক নন। ছাত্ররাও সব শিক্ষককে মনে চিরজাগরূক করে রাখে না। মানুষ অত বোকা নয়। শিক্ষকের খাতায় নাম লেখালেই কেউ একজন শিক্ষক হয়ে যান না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন : সকলেই কবি নয়,' কেউ কেউ কবি। শিক্ষকদের বেলাতেও কথাটা একই রকম খাটে। সকলেই শিক্ষক নয়, কেউ কেউ শিক্ষক। যে মানুষ ছাত্রদের বিকাশের ভেতর নিজের নিয়তিকে রক্তমাখা ভবিতব্য হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ছাত্রদের জীবনের ভেতর সবেবরাত রাতের কোটি কোটি প্রদীপের মতো জ্বলে উঠতে পারেন, তিনিই তো শিক্ষক। তাঁর স্মৃতিই তো ছাত্রের আমৃত্যু স্মরণ, তাঁর স্থাবার দিকেই তো ছাত্রের মর্ত্যকালের নিদ্রাহীনযাত্রা।